ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলোতে মেয়েশিক্ষার্থীদের খেলাধুলায় অংশগ্রহণের প্রবণতা

তানজীনা তানীন

> *My trainers taught me to believe in myself. I was inspired and learned determination and discipline. Sports allow you to get to know yourself.*
>
> *নাওয়াল ই মাওতাওয়াকেল, ১৯৮৪-এর অলিম্পিক হার্ডলস-এ মরোক্কোর প্রথম স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত নারী খেলোয়াড়*

খেলামাত্রই আনন্দের, বিনোদনের, প্রতিযোগিতার, নিজেকে জানার। খেলা সমাজের সকল শ্রেণির, সকল মানুষের। কিন্তু আমাদের সমাজে খেলামাত্রই ছেলে বা পুরুষদের, মেয়েমাত্রই খেলা বোঝে না। অথচ খেলাধুলা নারীদের জন্য এমন একটি ক্ষেত্র তৈরি করে, যেখানে তারা তাদের পরিচয় সংশোধন করতে পারে ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়। নারীরা খেলাধুলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কিছু দক্ষতা, যেমন, দলীয় কাজ, নেতৃত্ব, আত্মবিশ্বাস অর্জন করে। এটি আত্মসম্মানবোধে উন্নীত ও সুখ-সমৃদ্ধির পথে যাত্রাকে অগ্রসর করে নেয়। এ ছাড়াও, খেলাধুলায় অংশগ্রহণ একজন নারীর খাদ্যাভ্যাস, শরীরচর্চা ও আচরণে পরিবর্তন আনে, তাদের মধ্যে মানসিক স্থিতি আনে, স্থূলতা কমায়, হৃদরোগ ও দীর্ঘস্থায়ী অন্যান্য রোগ কমাতে সাহায্য করে। অনেক সময় অলস সময়ের দুঃচিন্তা ও হতাশা থেকে মেয়েরা আত্মহননের পথ বেছে নেয়, কিন্তু খেলাধুলায় যুক্ত হয়ে অলস সময়টা ভরিয়ে দিতে পারলে তা তাদের মানসিকভাবে শক্তি প্রদান করতে পারে। নারী খেলোয়াড়রা শারীরিকভাবে ফিট থাকে, যদিও এই ফিটনেসকে বেশিরভাগ সময়ই 'ম্যাসকুলিনিটি'র (পুরুষত্ব) সাথে তুলনা করা হয়।

আমাদের সমাজে নারীদের জীবনযাত্রায় বেশকিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। একজন নারী খেলোয়াড়কে লিঙ্গ ও পরিচয়ের জন্য নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। এটি খেলার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, যা একজন নারী খেলোয়াড়ের জীবনে কুপ্রভাব ফেলে। বিভিন্ন ক্ষেত্র (পিতৃতন্ত্র, পুঁজিবাদ, শ্রেণি, রাষ্ট্র, জাতীয়তাবাদ) থেকে চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে নারীদের বাধা প্রদান করা হয়ে থাকে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের নিয়ন্ত্রণ যেখানে সর্বত্র, সেখানে নারীরা সাধারণত পুরুষের তৈরি নিয়ম মেনে চলতে বাধ্য হয়। খেলাধুলায়

অংশগ্রহণের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটে নি। তবে এসব প্রতিবন্ধকতার বিপরীতেও আজকাল খেলাধুলার সম্ভাব্য সুযোগের পরিসর বাড়ছে এবং নারীরা খেলাধুলায় অংশও নিচ্ছে।

পূর্বের তুলনায় সম্প্রতি বাংলাদেশে পুরুষের পাশাপাশি নারীদের খেলাধুলায় অংশগ্রহণের প্রবণতা বেড়েছে এবং তারা সাফল্যও অর্জন করছে, যদিও সংখ্যায় তা অপ্রতুল। বিশ্বের উন্নত রাষ্ট্রের তুলনায় পিছিয়ে পড়া রাষ্ট্র হিসেবে যখন নারীর অধিকার অর্জন নিয়ে আমরা ব্যস্ত, তখন খেলাধুলায় পুরুষের পাশাপাশি নারীদের অংশগ্রহণও অনেক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই অবস্থায় আশানুরূপ না হলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু মেয়েশিক্ষার্থী খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করছে এবং সাফল্য অর্জন করছে। প্রতি বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে অন্তঃহল ও আন্তঃহল অ্যাথলেটিক্স, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন, টেবিল টেনিস খেলা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে খেলাধুলায় ভালো ফলাফল করা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে স্বর্ণপদক এনে দেওয়ার জন্য ব্লু অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। এ ছাড়া, মেয়েদের জন্য রোকেয়া পদক প্রদান করা হয়। তবে সামগ্রিকভাবে মনে হয়, মেয়েদের খেলাধুলার ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কিছুটা অনাগ্রহী। সামাজিক-সাংস্কৃতিক বাধার কারণে সব শ্রেণির পরিবারের মেয়েরা পেশাগত খেলায় আত্মনিয়োগ করছে না। এক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় পরিবার, সমাজের পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি, ধর্ম ও রক্ষণশীলতার বাধা নাকি নিজস্ব ইচ্ছা বা আগ্রহের অভাব নাকি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ— সেটিই আলোচ্য লেখার মূল প্রতিপাদ্য।

প্রেক্ষাপট

খেলাধুলা একজন শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা নিশ্চিত করে এবং সামাজিক সম্পর্ক বৃদ্ধি করে। খেলাধুলা সংগঠিত, প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ, বিনোদনধর্মী, দক্ষতাসূচক শারীরিক কার্যকলাপ প্রদর্শনের উত্তম ক্ষেত্র। খেলাধুলায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে অর্জিত কিছু সুগঠিত গুণ দৈনন্দিন জীবনযাপনে প্রয়োগ করা যায়; যেমন, নেতৃত্ব, আত্মবিশ্বাস, দলীয় কাজ, উৎসর্গ, গভীরভাবে মনোনিবেশ, প্রভৃতি। এসব গুণ প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্য অর্জনেও প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু বর্তমান সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা খেলাধুলায় অংশ নিচ্ছে কি না সেটা একটা উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেননা 'পালঙ্ক আলু' (কোচ পটেটো) সংস্কৃতি ইদানীং তরুণদের লাইফ স্টাইলে পরিণত হয়েছে। আর যারা খেলাধুলায় অংশ নিচ্ছে, তাদের মধ্যেও মেয়েশিক্ষার্থীদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। এক্ষেত্রে জেন্ডারের প্রশ্নও এসে যায়, যখন দেখা যায় যে, মেয়েশিক্ষার্থীদের মধ্যে যারা খেলাধুলায় অংশ নেয়, বয়স ১৬-১৮ হওয়ার পরে তাদের সংখ্যাও ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। অথচ খেলায় অংশগ্রহণ একজন মেয়েশিক্ষার্থীকে সবদিক থেকেই উত্তমভাবে শিক্ষিত করে তুলতে পারে।

সাধারণভাবে বাংলাদেশি জনগণ ক্রীড়ামোদি। এক কালে গ্রাম থেকে শহর পর্যন্ত সর্বত্রই কিশোরকিশোরীরা অবসর পেলে খেলায় নিমগ্ন হয়ে যেত। ডিজিটাল আগ্রাসনে গ্রাম-শহর সর্বত্রই এই প্রবণতা কমতে থাকলেও গ্রামে এখনো এ দৃশ্য বিরল নয়। তবে সর্বত্রই কিশোরকিশোরীরা একটা নির্দিষ্ট বয়স পেরোনোর পর খেলাধুলা থেকে সরে যায়।

মেয়েদের ক্ষেত্রে এটা বেশি ঘটে। 'মেয়েরা বড়ো হয়ে গেলে আর খেলায় অংশ নিতে পারে না', এই ধারণা থেকে আমাদের সমাজ এখনো বেরিয়ে আসতে পারে নি।

খেলাধুলায় নারীদের অংশগ্রহণ শুরু হয়েছে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে। ১৯৫৪ সালে প্রথম পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান অলিম্পিকে অংশ নেয়। আশির দশকে অনেক নারী খেলোয়াড়কে কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে দেখা গেছে; যেমন, কামরুন্নেসা লিপি, শর্মিলা রায়, মরিয়ম তারেক, কামরুন্নাহার ডানা প্রমুখ। আরো ছিলেন টেবিল টেনিস খেলোয়াড় মুনিরা রহমান হেলেন, জোবেরা রহমান লিনু, সাঁতারু ডালিয়া, দাবারু রাণি হামিদ। কিন্তু নব্বইয়ের দশকে এক্ষেত্রে নারীদের সাফল্য কমতে থাকে। কিন্তু পুরুষেরা এক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে গেছে। পুরুষের পাশাপাশি নারীদের এ সুযোগ আজ আর নেই বললেই চলে। কেননা নারীদের জন্য খেলা বাংলাদেশে সম্মানজনক কোনো পেশা নয়। বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে তাকালেও খেলাধুলায় মেয়েশিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের প্রবণতা কমার চিত্র দেখা যায়। খেলাধুলার সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক শিক্ষার্থীদের যে অভিজ্ঞতা তা বারবার পুনর্নির্মাণ করা হয় পিতৃতন্ত্র, পুঁজিবাদ, শ্রেণি, রাষ্ট্র, জাতীয়তাবাদ দিয়ে। এক্ষেত্রে লিঙ্গ পরিচয় ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ইউরোপীয়ান পার্লামেন্টের কার্যবিধির 'ওমেন অ্যান্ড স্পোর্ট' (২০০৩) অংশে বলা হয়েছে,

> Women's sport is an expression of the right to equality and the freedom of all women to take control of their bodies and participate in sports publicly, regardless of nationality, age, disability, sexual orientation or religion.

নারীদের কাছে খেলার অভিজ্ঞতাটা একইসাথে 'লিবারেটিং ফোর্স' ও 'স্ট্রাকচারিং মেকানিজম' দ্বারা পরিচালিত হয়। ইউনেস্কো ইন্টারন্যাশনাল চার্টার অব ফিজিক্যাল এডুকেশন অ্যান্ড স্পোর্টস-এর আর্টিকেল ১-এ বলা হয়েছে, 'শারীরিক শিক্ষাকেন্দ্রের চর্চা ও খেলাধুলা সকলের একটি মৌলিক অধিকার' এবং ২৪ নম্বর আর্টিকেলে বলা হয়েছে, প্রত্যেক মানুষেরই বিশ্রাম ও অবসর সময় পাওয়ার অধিকার রয়েছে। সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক জীবনে অংশ নেওয়ারও অধিকার রয়েছে। অথচ এ সম্পর্কে নারীরাও অবগত নয়।

এ প্রবন্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিপ্রেক্ষিতে নারীদের খেলাধুলার অভিজ্ঞতা এবং এক্ষেত্রে সামাজিক, জাতীয় ও বৈশ্বিক বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা কীভাবে প্রভাব ফেলে তা পর্যালোচনা করে দেখানো হয়েছে। এর উদ্দেশ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে আবাসিক মেয়েশিক্ষার্থীদের খেলায় অংশগ্রহণ কেমন সে সম্পর্কে জানা। এর মাধ্যমে মেয়েদের নিজস্ব লিঙ্গ পরিচয় তাদের খেলা সম্পর্কিত অভিজ্ঞতায় কীভাবে কী ধরনের প্রভাব ফেলছে তা খুঁজে বের করা হয়েছে।

প্রবন্ধটিতে মূলত নিম্নোক্ত প্রশ্নসমূহের উত্তর খোঁজা হয়েছে—

- খেলাধুলায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলোর মেয়েশিক্ষার্থীদের উৎসাহের মাত্রা কেমন?

- খেলাধুলায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলোর মেয়েশিক্ষার্থীরা কী ধরনের প্রতিবন্ধকতার (ভাবাদর্শগত, সাংস্কৃতিক) শিকার হচ্ছে?
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণিকাঠামো ও মেয়েদের খেলাধুলায় অংশগ্রহণের মধ্যকার সম্পর্ক কী?
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলোর নারী খেলোয়াড়রা তাদের লিঙ্গ পরিচয়কে কীভাবে দেখে?

প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা

হানাদি ইয়াগোব, তাঁর 'ডেভেলপমেন্ট অব ওমেনস পার্টিসিপেশন ইন স্পোর্টস ইন দ্য সুদান' শীর্ষক গবেষণার মাধ্যমে সুদানে নারী খেলোয়াড় কমে যাওয়ায় নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর ক্ষেত্রে কী কী বিষয় প্রভাব ফেলে তা খতিয়ে দেখেছেন। এক্ষেত্রে সুদানীয় নারীরা সামাজিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার শিকার হয় বলে গবেষণায় দেখানো হয়েছে। সুদানের নারীরা ১৯৬০ থেকে ১৯৮৮ পর্যন্ত এক্ষেত্রে যা অর্জন করে, তা ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পরই হারিয়ে ফেলে। বিভিন্ন খেলাধুলায় বাধা আসতে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০০৩-এ যুব ও খেলাধুলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় নারীদের ফুটবল খেলায় নিষেধাজ্ঞা জারি করে। নারীদের উন্মুক্ত মাঠে খেলা নিষেধ করা হয়। তা ছাড়া, পুরুষের প্রতিও নারীদের খেলা দেখা যাবে না এমন নিষেধাজ্ঞা ছিল। ফলে নারীরা খেলার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। তাদের পরিবার থেকেও বাধা প্রদান করা হয়। তদুপরি, সুদানের বড়ো শহরগুলোতে পরিবারসমূহে প্রচলিত স্টেরিওটাইপ ও বিভিন্ন মতাদর্শের কারণেও নারীদের খেলায় অংশগ্রহণে নিরুৎসাহিত করা হয়। তারা মনে করে, খেলায় তাদের সময় নষ্ট হচ্ছে। এই সময়টুকু তারা পড়াশোনায় ব্যয় করতে পারে। নারীদের খেলাধুলার সাথে অর্থনীতি ও স্থান জড়িত। কেননা খেলার অনুশীলনের জন্য ক্লাব দরকার। আর ক্লাবের সাবসক্রিপশন ফি সচ্ছল পরিবার ছাড়া দরিদ্র পরিবার দিতে পারে না। তা ছাড়া, মেয়েদের খেলাধুলার জন্য এমন স্থান নির্বাচন করা দরকার, যেখানে পুরুষ যেতে পারবে না। এটিও সবসময় সহজলভ্য হয় না।

একটি পরিবারের অর্থনৈতিক সচ্ছলতা, সচেতনতা, বোধগম্যতা নারীদের খেলায় অংশগ্রহণের পেছনে অনেক বড়ো ভূমিকা পালন করে থাকে। এক্ষেত্রে সমাজের তুলনায় পরিবারই বেশি প্রভাব ফেলে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ওখানে কয়েকটি উৎপাদককে চিহ্নিত করা হয়েছে : সচেতনতা, অভিগম্যতা, ব্যবহারযোগ্যতা, ব্যক্তিগত কারণ, অর্থ, ব্যক্তিগত সময় এবং সম্ভাবনা।

কানাডিয়ান স্পোর্টস অ্যান্ড লাইফ অ্যাসোসিয়েশন-এর 'অ্যাকটিভলি এনগেজিং উইমেন অ্যান্ড গার্লস' ক্রোড়পত্রটি খেলাধুলায় অংশগ্রহণে নারীদের মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক উপাদানগুলোকে উদ্দেশ্য করে লেখা হয়েছে। ক্রোড়পত্রটির সেকশন ক-তে কম ও মধ্যবয়সী মেয়েদের খেলাধুলা ও শারীরিক কর্মকাণ্ডের উপকার ও বাধা সম্পর্কে বলা হয়েছে। খেলাধুলায় অংশ নেওয়া মেয়েরা কমিউনিটি লাইফে অনেক বেশি প্রকাশ্যে ও সমান অংশীদারিত্বে কাজ করতে পারে। এ ছাড়া, সমাজে তাদের ভূমিকা ও সামর্থ্য অনুযায়ী তারা সামাজিক প্রথা পরিবর্তনে অবদান রাখতে পারে। অথচ এই

উপকারিতাগুলো সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও কানাডিয়ান নারীরা খেলাধুলায় পিছিয়ে আছে বলে বলা হয়েছে আলোচ্য ক্রোড়পত্রে।

ক্লোটিলডে টেলেও তাঁর 'জেন্ডার ইকুয়ালিটি ইন স্পোর্টস' বইয়ে ইউরোপের বিভিন্ন খেলার পরিবেশে নারীদের খেলাধুলায় অংশগ্রহণ নিয়ে গবেষণা করেছেন। এখানে মেয়েরা কোন কোন খেলার সাথে জড়িত, খেলাধুলায় তাদের প্রবেশাধিকার ও প্রতিবন্ধকতাসমূহ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই গবেষণায় খেলাধুলায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়ের সংখ্যার পার্থক্য তুলে ধরা হয়েছে। বলা হয়েছে, খেলাধুলায় অংশগ্রহণের পেছনে ছেলে ও মেয়েদের প্রেষণার মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। ছেলেরা অন্যদের তুলনায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্য, আনন্দ পাওয়ার জন্য খেলে। অপরদিকে মেয়েরা ফিটনেস ঠিক রাখা ও ওজন নিয়ন্ত্রণের জন্য খেলে থাকে। কিছু নারী জেন্ডারনির্দিষ্ট খেলাধুলার বাইরে গিয়ে অংশ নিচ্ছে ভারোত্তলক ও বাইক রেসে, তখন তাদের সম্বোধন করা হয় টমবয় হিসেবে।

ডোনা লুইস ম্যাকগুইন (২০১১) তাঁর 'এ কমপারেটিভ অ্যানালাইসিস অব জেন্ডার ডেসপ্যারিটি ইন ব্রিটিশ ফুটবল অ্যান্ড ব্রিটিশ অ্যাথলেটিক্স' গবেষণায় ব্রিটেনে এলিট স্পোর্টস-এ জেন্ডারের অবস্থা তুলে ধরেছেন। এক্ষেত্রে কেসস্টাডি হিসেবে তিনি ফুটবল খেলা ও অ্যাথলেটিক্সকে বেছে নিয়েছেন। তিনি পিতৃতন্ত্রের প্রভাব তুলে ধরে সমাজে পুরুষতন্ত্রের প্রভাব দেখিয়েছেন, যেখানে তিনি 'ডুয়িং জেন্ডার'-এর ধারণা দিয়েছেন। অর্থাৎ তিনি বলেছেন, আমরা আমাদের কাজের মাধ্যমে জেন্ডার নির্ধারণ করে থাকি। এ ছাড়া, এই গবেষণায় গণমাধ্যমের ভূমিকার কথাও তত্ত্বের মাধ্যমে পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন। মূলত খেলাধুলায় জেন্ডার কতটা প্রভাব ফেলে তা বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে আলোচ্য গবেষণায়।

বলা হয়েছে, ছেলেরা খেলায় খারাপ করলে তাদের মেয়েদের সাথে তুলনা করা হয়। এর মাধ্যমে বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে মেয়েরা ফুটবল খেলতে পারবে না। ব্রিটেনেও নারী খেলোয়াড়দের হেয় প্রতিপন্ন করা হয় এবং খেলার ক্লাবগুলো বেশিরভাগই ছেলেদের। মেয়েদের ফুটবল বিশ্বকাপের সময়েও নারীদের খেলা মিডিয়ায় ততটা কাভারেজ পায় নি। মূলত ফুটবল ও অ্যাথলেটিক্সের মধ্যে কোনটি কতটা ম্যাসকুলিন তা দেখানো হয়েছে এই গবেষণায়।

গবেষণা পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণাটি আধেয় বিশ্লেষণ এবং ইন-ডেপথ ইন্টারভিউ তথা বিস্তারিত সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়েছে।

প্রাথমিক উৎস : গবেষণায় অংশগ্রহণকারী নির্বাচিত পাঁচটি হলের আবাসিক মেয়েশিক্ষার্থী, বিশেষ করে যারা নিকটবর্তী উৎস, তাদের থেকে মূল তথ্য ও সাক্ষাৎকারলব্ধ তথ্য নেওয়া হয়েছে এবং পর্যালোচনা করা হয়েছে। নির্দিষ্ট প্রশ্নমালার ভিত্তিতে তাদের ৪৫-৬০ মিনিটের বিস্তারিত সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। সাক্ষাৎকার নেবার পরিবেশ ছিল যথোপযুক্ত। তা ছাড়া, এগুলো ছিল অনানুষ্ঠানিক ও নমনীয়। সাক্ষাৎকারে বিষয়টিকে ফোকাসে রেখে তাদের স্কুলের অভিজ্ঞতার কথা জানতে চাওয়া হয়েছিল। এর মাধ্যমে

অংশগ্রহণকারীরা তিনটি দলে চিহ্নিত হয়েছে : ১. যারা কখনোই খেলাধুলায় অংশ নেয় নি, ২. যারা ১০ থেকে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত অংশ নিয়েছে এবং ৩. যারা এখনো খেলায় অংশ নিচ্ছে।

পরোক্ষ উৎস : পরোক্ষ উৎস হিসেবে তথ্যপ্রাপ্তির জন্য ব্যবহার করা হয়েছে খেলাধুলাবিষয়ক গবেষণাসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সাময়িকী, বই, ওয়েবসাইট ও প্রবন্ধ-নিবন্ধ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিপ্রেক্ষিতে এ ধরনের গবেষণা অপ্রতুল হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক নারীদের দেওয়া সাক্ষাৎকার গবেষণায় তথ্যের ভালো উৎস হিসেবে কাজে লেগেছে। এ ছাড়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে পত্রিকা বের হয়, সেখানে বার্ষিক খেলাধুলার বিবরণ, প্রতিযোগিতা সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া গেছে। খেলার ফলাফলের সাথে পাওয়া গেছে খেলোয়াড়দের প্রোফাইল। এ প্রক্রিয়ায় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

গবেষণা এলাকা নির্ধারণ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নারীদের জন্য হল রয়েছে মোট পাঁচটি, যারা অন্তঃহল ও আন্তঃহল ক্রীড়ায় অংশগ্রহণ করে; যথা, রোকেয়া হল, শামসুন্নাহার হল, সুফিয়া কামাল হল, বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হল, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব হল। এই ৫টি হলকেই কর্মএলাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

সাক্ষাৎকার : সাক্ষাৎকারের জন্য ৫ জন সাধারণ শিক্ষার্থী ও ৫ জন খেলোয়াড় শিক্ষার্থী নেওয়া হয়েছে, যারা নির্দিষ্ট হলে প্রতিবছরই অনুশীলন ও খেলায় অংশগ্রহণ করে। এই ১০ জন শিক্ষার্থীর বয়স ১৮ থেকে ২৩ বছর। বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার পূর্বে খেলায় অংশ নিত ও বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে নতুনভাবে অংশ নিচ্ছে এমন দুই শ্রেণির নারীদেরও গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরিক শিক্ষাকেন্দ্রের ১ জন নারী প্রশিক্ষক ও ১ জন পুরুষ প্রশিক্ষকের বিস্তারিত সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। আধেয় বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে নির্বাচিত ১০ জন শিক্ষার্থী ও দুইজন প্রশিক্ষক বিস্তারিত সাক্ষাৎকারের জন্য নির্বাচিত হয়েছে।

তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন ও ফলাফল বিশ্লেষণ

সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে সাধারণ শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে নেওয়া তথ্য অনুযায়ী তারা যে কারণে খেলাধুলায় অংশ নেয় না, সেরকম কিছু কারণ চিহ্নিত হয়েছে। এই কারণগুলো মেয়েদের খেলাধুলায় অংশগ্রহণের প্রতিবন্ধকতা হিসেবে গুরুত্ব পেতে পারে। নিম্নে শতকরা হারে চিহ্নিত প্রতিবন্ধকতাসমূহ দেখানো হলো :

সাধারণ শিক্ষার্থী

প্রতিবন্ধকতা	ধর্ম	জেন্ডার	পরিবার	সময়	শারীরিক দুর্বলতা	খেলার পোশাক	পরিবেশ
শতকরা হার	২৫%	৫০%	৭৫%	১৫%	১০%	২০%	৪০%

খেলোয়াড় শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, তাদের খেলাধুলায় অংশগ্রহণের পিছনে পরিবারসদস্যরা কীভাবে প্রভাবিত করেছেন, তা বের হয়ে এসেছে। নিম্নে শতকরা হারে প্রভাবক সদস্যদের চিত্র তুলে ধরা হলো :

খেলোয়াড় শিক্ষার্থী

পরিবারের প্রভাবক সদস্য	প্রভাবিত হওয়ার মাত্রা
বাবা	৬০% (১০ জন শিক্ষার্থী)
মা	৩৬.৬% (৯ জন শিক্ষার্থী)
ভাই	২৩.৩% (৭ জন শিক্ষার্থী)
বোন	১% (২ জন শিক্ষার্থী)
অন্যান্য	৫৩.৩% (১০ জন শিক্ষার্থী)

খেলোয়াড় শিক্ষার্থীদের খেলায় সংশ্লিষ্ট থাকার সময়

নাম	হল	খেলার সময়
নুসরাত খানম	বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব হল	৪ বছর
আফিয়া জাহান সেতু	বেগম রোকেয়া হল	৬ বছর
বেনজীর হোসেন	সুফিয়া কামাল হল	৩ বছর
সুখী আক্তার	কুয়েত মৈত্রী হল	১২ বছর
লিলি হোসেন	শামসুন্নাহার হল	১১ বছর

সাধারণ শিক্ষার্থীরা যে সময় পর্যন্ত খেলাধুলায় সংশ্লিষ্ট ছিল

নাম	বিভাগ	হল	যে শ্রেণি পর্যন্ত খেলাধুলার সাথে যুক্ত ছিল
তাসলিমা ইসলাম স্মৃতি	রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ	রোকেয়া হল	অষ্টম শ্রেণি
সাদিয়া আফরিন শিল্পী	তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগ	কবি সুফিয়া কামাল হল	ষষ্ঠ শ্রেণি
আইরিন রহমান	স্বাস্থ্য অর্থনীতি বিভাগ	শামসুন্নাহার হল	সপ্তম শ্রেণি
ফারজানা আখতার	রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ	বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব হল	ষষ্ঠ শ্রেণি
রুপসা খাতুন	সমাজবিজ্ঞান বিভাগ	কুয়েত মৈত্রী হল	ষষ্ঠ শ্রেণি

সাক্ষাৎকার পর্যালোচনার মাধ্যমে সাধারণ শিক্ষার্থী ও খেলোয়াড় শিক্ষার্থীদের মধ্যে দুই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি/মতামত পাওয়া গেছে। তাদের আলোচনার সাপেক্ষে নিম্নে তা উপস্থাপিত হলো—

বিনোদন

খেলোয়াড়রা মূলত নির্মল আনন্দের জন্যই খেলায় অংশ নিয়ে থাকে। নুসরাত বলেন, 'ছোটবেলায় কখনো প্রতিযোগিতায় অংশ নেই নি, ভালো লাগত তাই খেলতাম। এখনো বাসায় গেলে আব্বুর সাথে ক্রিকেট খেলি। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে এসে প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া শুরু করেছেন। সুখী বলেন, 'গ্রামের মাঠে বৌচি, কুমির ডাঙা খেলাগুলোর মজাই আলাদা। এই আনন্দটুকু পাওয়ার জন্যই খেলতাম। এখন যখন হলে ফুটবল অনুশীলনে নামি, তখন প্রতিযোগিতার চেয়ে অনেক বেশি আনন্দ পাই, শান্তি পাই'।

খেলাটা ব্যক্তিগত অনুপ্রেরণার জায়গা। খেলে তারা মন থেকে শান্তি পাচ্ছেন। নিজের ভালো লাগাটাও অনেক বড়ো একটা ব্যাপার। ভালো লাগলে একটা সন্তুষ্টি আসে। অনেকের কাছে খেলাটা অবসরের বিনোদন, প্রফেশনালি নেওয়ার ইচ্ছা নেই। অনেকে খেললে রিল্যাক্স ফিল করেন। মানসিকভাবে শান্তি পান। তাদের মতে, খেলাধুলা নির্মল আনন্দ ও বিনোদনের অন্যতম একটি উপায়, যা মন ভালো রাখে। কারণ মনের সাথে শরীরের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। এতে কাজের প্রতি আলাদা অনুপ্রেরণা পাওয়া যায়।

আত্মবিশ্বাস

সাক্ষাৎকারে অংশ নেওয়া প্রত্যেক নারী খেলোয়াড়ই অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী। যারা স্কুল থেকেই খেলছেন তারা মনে করেন, খেলার কারণে অনেক কাজ করতেই ভয় কাজ করে না। অংশগ্রহণ করার সাহসটাও থাকে। এ প্রসঙ্গে সুখী বলেন, 'আগে পাবলিক প্লেসে নিজেকে উপস্থাপন করতে পারতাম না। মনে হতো মানুষ আমাকে কীভাবে দেখছে কিংবা কী ভাবছে। কিন্তু এখন আমি এগুলো নিয়ে ভাবি না'। খেলাধুলায় অংশগ্রহণের ফলে নিজস্ব পরিচিতিও গড়ে ওঠে। নুসরাত বলেন, 'আগে ইনট্রুভার্ট ছিলাম'। কিন্তু খেলাধুলা শুরু করার পর যখন সবার সাথে মেলামেশার সুযোগ পেয়েছেন ও খেলায় ভালোও করেছেন, তখন মনে হয়েছে যে তিনিও পারছেন। এই ছোট ছোট বিষয়গুলো তাদের আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছে। খেলায় নেতৃত্ব দেবার অভিজ্ঞতাটাকে মনে হয়েছে যে এটা ব্যক্তিজীবনেও অনেক কাজে লাগবে।

তা ছাড়া, শৃঙ্খলা শেখারও একটা বড়ো জায়গা হচ্ছে খেলাধুলা। এর মাধ্যমে নিয়মকানুন মেনে চলার প্রবণতা তৈরি হয়। হেরে গেলেও তা মেনে নিতে হবে, কারণ প্রতিযোগিতায় জয়-পরাজয় থাকে। এই শিক্ষা জীবনের জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, জীবনে জয়-পরাজয় থাকবেই, তবু অংশগ্রহণ করতে হবে, চেষ্টা করতে হবে। এসব ছোটখাটো কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দৈনন্দিন জীবনে অনেক কাজে লাগে।

এ ছাড়া, খেলাধুলার মাধ্যমে আত্মবিশ্বাসীও হওয়া যায়। যেকোনো নতুন কাজ করতে গেলে একজন আত্মবিশ্বাসী মানুষের মধ্যে কোনো ভয় কাজ করে না।

সাহস

খেলাধুলায় অংশগ্রহণকারী মেয়েদের মধ্যে পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি সাহসিকতা লক্ষ করা গেছে। এ বিষয়ে প্রত্যেক খেলোয়াড়ই বলেন, কাজ করতে ও কথা বলতে তাদের মধ্যে

আর জড়তা কাজ করে না। লিলি বলেন, 'জার্সি পরলেই একটা ভাব চলে আসে। তখন নিজেকে সাধারণ মনে হয় না। যখন হলের কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্সি পরি, তখন সেটাকে একটা অন্যরকম বিষয় বলে মনে হয়। কারণ তখন আমি বিশ্ববিদ্যালয়কে রিপ্রেজেন্ট করি। তখন আমিও ওয়্যারিয়র, এটা একটা গর্বের বিষয়।' তা ছাড়া, খেলার ফলে ফিজিক্যাল ফিটনেস চলে আসে। সবার মধ্যে নিজেকে দাঁড় করাতে সংকোচ কাজ করে না।

সামাজিক যোগাযোগ

খেলাধুলার মাধ্যমে সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ তৈরি হয়। সবার সাথে পরিচিত হওয়া যায়, তাতে যোগাযোগ বাড়ে। আন্তঃসম্পর্ক বৃদ্ধি পায়। এ প্রসঙ্গে বেনজীর বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলায় অংশ নেওয়ার একটা অন্যতম কারণ ছিল নতুন মানুষের সাথে পরিচত হবার ব্যাপারটা। বাসায় যখন ছিলাম, তখন মানুষের সাথে পরিচিত হওয়া, কথা বলার সুযোগ কম ছিল। আমার মনে হতো, আমার অনেক বড়ো একটা ফ্রেন্ডসার্কেল থাকবে, যোগাযোগ বাড়বে। হয়েছেও তাই। খেলার সাহায্যে অনেক মানুষের সাথে আমি পরিচিত হয়েছি।'

খেলায় অংশগ্রহণের ফলে সিনিয়র, জুনিয়র অনেকের সাথেই মেশার সুযোগ পাওয়া যায়। শিক্ষকদের সাথেও সুসম্পর্ক হয়। আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় খেলার কারণে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার সুযোগ ঘটে। খেলার উদ্দেশ্যে সবার সাথে মিলে কোথাও যাওয়া, একসাথে থাকা, নতুনদের সাথে পরিচিত হওয়া, ইত্যাদি যে সামাজিক সম্পর্কের সুযোগ এনে দেয়, তা তুলনাহীন।

সুযোগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েশিক্ষার্থীরা খেলাধুলার সুযোগ সুবিধা কেমন পায়, সে বিষয়ে জানতে চাওয়া হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরিক শিক্ষাকেন্দ্রের কর্মকর্তাদের কাছে। তাদের দেওয়া তথ্য থেকে জানা যায়, শারীরিক শিক্ষাকেন্দ্রের জিমনেসিয়ামে ছেলে ও মেয়েদের শরীরচর্চার জন্য দুই শিফটে সময় ভাগ করা আছে। মেয়েদের জন্য সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১টা, ছেলেদের জন্য দুপুর ৩টা থেকে রাত ৮টা। ওখানে দেখা যায়, শরীরচর্চায় অংশগ্রহণকারী মাত্র ৫ জন মেয়েকে, যাদের মধ্যে ২ জন শিক্ষার্থী নন। অপরদিকে অংশগ্রহণকারী ছেলেদের সংখ্যা ছিল ৪০+। ছেলে ও মেয়েদের সংখ্যার এ তারতম্যের কারণ হিসেবে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি না থাকার কথা জানা যায়। ব্যায়ামের জন্য যে ধরনের যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়, তা অপ্রতুল এবং সেগুলো বিশেষভাবে ছেলেদের। নারীদের জন্য আলাদা কিছু যন্ত্রপাতি প্রয়োজন হলেও তা জিমনেসিয়ামে নেই। এ সংকট কাটাতে মেয়েদের জন্য বিশেষ কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয় কি না জানতে চাইলে নেতিবাচক জবাব পাওয়া যায়।

হলগুলোর মাঠেও কোনো খেলার পরিবেশ নেই। হলগুলো এ ব্যাপারে কোনো চিন্তাই করে না। খেলায় মেয়েদের অনুপ্রেরণা দেওয়ার জন্যেও হলে কোনো ব্যবস্থা নেই বলে জানান সালমা আরজু। তবে পিংকি জানান, কোনো খেলোয়াড় হল থেকে তিনবার

স্বর্ণপদক পেলে তাকে ব্লেজার প্রদান করা হয়। এটিও তার কাছে এক ধরনের অনুপ্রেরণা বলে মনে হয়। আবার এ ব্যাপারে নুসরাত জানান, খেলার পরে হল থেকে খেলার পোশাক ফিরিয়ে নেওয়া হয়। এটি খেলোয়াড়দের মনে একটি খারাপ মনোভাব তৈরি করে। সুফিয়া কামাল হলে খেলার সরঞ্জামও তেমন নেই। ব্যবস্থা না থাকায় মেয়েদের অনুশীলনের জন্য জিমনেসিয়ামে যাওয়াটাও সম্ভব হয়ে ওঠে না। হলগুলো ইচ্ছে করলেই এর জন্য বাজেট রাখতে পারে। অথবা মাঠ থাকলে তা সংস্কার করতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও আলাদা কোনো সুবিধা দেওয়া হয় না, বিভাগ থেকেও না। অর্থাৎ খেলার জন্য কেউই সময় দিতে চায় না। পূর্বে সুলতানা কামাল অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হতো। এখন সেটাও বন্ধ হয়ে গেছে। তবে বর্তমানে আবদুল মতিন অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয় বলে জানান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরিক শিক্ষাকেন্দ্রের উপপরিচালক সালমা আরজু। তিনি নিজেও একসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলোয়াড় ছিলেন। প্রশিক্ষক সালমা মনে করেন, প্রতিটি হলে একজন প্রশিক্ষক নিয়োগ করা উচিত, যারা খেলোয়াড়দের তত্ত্বাবধান করবে এবং খেলায় অংশগ্রহণ ও সাফল্য অর্জনের জন্য উদ্বুদ্ধ করবে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শারীরিক শিক্ষা বিষয়টিতে গুরুত্ব প্রদান করা হয় না। খেলায় অংশগ্রহণে অনীহার এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। বেশিরভাগ সময়ই পরিবার থেকে বাধা আসে। বর্তমানে মেয়েরা বাহ্যিক সৌন্দর্য নিয়ে বেশি চিন্তিত; আত্মবিশ্বাসী, প্রত্যয়ী রোল মডেলদের নিয়ে নয়।

খেলা ব্যাপারটা মাত্র কিছু সময়ের জন্য নয়। কিন্তু বছরজুড়ে খেলার কোনো সুযোগ বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই। যা কিছু হয় তার প্রায় পুরোটাই নিজস্ব উদ্যোগে, এতে রিস্কটাও নিজেদের ওপরে বর্তায়।

জেন্ডার

আইরিন বলেন, 'কিছু খেলাধুলায় ছেলে ও মেয়েতে পার্থক্য আছে; যেমন, রেসলিং, লিফটিং, লংজাম্প। এগুলো বড়োভাই খেলত। কিছুকিছু খেলা আছে মেয়েরা পারে না।' 'খেলার কারণে আমার হাঁটাচলায় একটা ছেলে-ছেলে ভাব চলে এসেছে। আমাকে তো অনেকে টমবয় বলে থাকে। মাঝখানে তো খুব ভালো লাগত ছেলে হয়ে যাচ্ছি বলে', বলেন লিলি।

ছেলেরা মনে করে, মেয়েরা অনেক দুর্বল। তারা হাসিঠাট্টা করে। তাদের মধ্যে 'মেয়েরা কিছু করতে পারবে না' এমন ভাবনা কাজ করে। অনেক ছেলে মজা নেওয়ার জন্য খেলা দেখতে আসে। তাদের কাছে মেয়েদের খেলা চরম বিনোদনের বিষয়।

পরিবার

সোশ্যালিস্ট ফেমিনিস্ট ফ্রেমওয়ার্ক-এর মতে, পরিবারে ভাই কিংবা বাবার গুরুত্বপূর্ণ অবদান থাকে। তবে এক্ষেত্রে সাধারণ শিক্ষার্থী ও খেলোয়াড় শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরিবারের দুই ধরনের প্রভাব লক্ষ করা গেছে। খেলোয়াড় শিক্ষার্থীদের পরিবারের ভূমিকা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ইতিবাচক। খেলায় অংশগ্রহণের ফলে আহত হওয়ার ব্যাপারে তাদের

মধ্যে সবসময় একটা দুশ্চিন্তা কাজ করে, তবে একে তারা কখনো নেতিবাচক হিসেবে দেখেন না।

ফারজানা বলেন, 'ছোটবেলায় খেলাধুলায় আগ্রহ ছিল, এখন নেই। যখন ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ি, তখন পর্যন্ত পরিবার থেকে কিছু না বললেও পরে ভাই একদিন বলল, আর খেলা করার দরকার নেই। তারপর আমার আগ্রহও ধীরে ধীরে কমে গেল।' পরিবার থেকে সাপোর্ট পেলে বিষয়গুলো অনেক সহজ হয়। কিন্তু বড়ো হয়ে গেছ, খেলে কী হবে— এ জাতীয় মন্তব্য মেয়েদের খেলাধুলায় নিরুৎসাহিত করে। মেয়েদের খেলাধুলায় অংশগ্রহণকে এখনো অনেক পরিবার সহজভাবে নিতে পারে না। মেয়েরা আর সবকিছু উপেক্ষা করতে পারলেও পরিবারকে উপেক্ষা করতে পারে না। ফলে পরিবারের সাপোর্ট অনেক বড়ো একটি ব্যাপার হিসেবে সামনে এসে দাঁড়ায়। খেলোয়াড় মেয়েদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, তাদের সবাইকেই পরিবার থেকে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ বাধা দেওয়া হয় নি।

মেয়েদের ব্যাপারে আমাদের ধ্যান-ধারণা এখনো প্রায় আগের মতোই আছে। মেয়েরা এখনো নিজেরা স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। কারণ তাদের পুরোপুরি ক্ষমতা দেওয়া হয় নি। একেক পরিবারের মূল্যবোধ থাকে একেকরকম। স্মৃতি বলেন, 'আমার সাইকেল চালাতে ভালো লাগত, কিন্তু ভাই নিষেধ করেছিল তাই বাদ দিয়েছি। আব্বাকে বলি নাই। কারণ ভাই যেটা বলবে, সেটাকেই ঠিক মনে করতাম। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে আর কোনো বাধা পাই নি তাই খেলেছি। খেলোয়াড় লিলি বলেন, তার বাবা বলেন খেললে অনেক ভালো করবে। বন্ধুরাও উৎসাহ দেয়।

পরিবেশ

নুসরাত জানায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে যখন দেখেছি খেলার সেই পরিবেশটা আছে, মেয়েরা মেয়েদের সাথে আন্তঃহল খেলা খেলছে, যেখানে ছেলেরা নাই; তখন আগ্রহ জন্মেছে খেলায় অংশ নেওয়ার ব্যাপারে। তিনি বলেন, পরিস্থিতির আরো উন্নতি হতে পারে। সুযোগ বাড়তে পারে। ক্লাসের সময়, পরীক্ষার সময় তেমন সুবিধা তো দেওয়া হয় না। শাম্মী মনে করেন, 'সাধারণ শিক্ষার্থীরা মাঠেই যায় না, তাই পরিবেশটা বুঝতে পারে না। না গিয়ে মনে করে পরিবেশ ভালো না।'

আমাদের সমাজব্যবস্থা এখনো পরিবর্তন হয় নি। বাসার আশেপাশে গিয়ে খেললে সেটা অনেক অপমানকর হয়। পরিবেশ ভালো হলে, উন্নত উপকরণ থাকলে, অবশ্যই অনেক মেয়ে খেলায় আগ্রহী হতো। হল থেকে তেমন কোনো সুবিধা দেওয়া হয় না। তখন খেলার প্রতি আগ্রহ চলে যায়। খেলতে গিয়ে অনেক খেলোয়াড় ইনজুরিতে পড়ে, সেই খরচটাও হল থেকে দেওয়া হয় না। এক্ষেত্রে বলা হয়, হলের কোনো বাজেট নেই।

খেলার জন্য খেলোয়াড় সুখীর টিউশনিটাও চলে গেছে। অনেক কিছু মিস করতে হয় খেলার কারণে। অথচ এজন্য হল, বিশ্ববিদ্যালয় কিছুই দেয় না, বলেন সুখী। লিলি বলেন, পরের বছর থেকে আর খেলব না। হলের খেলাটা, বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলাটা সিজন্যাল। নির্দিষ্ট একটা সময়ে খেলার জন্য তোড়জোড় করা হয়। এসব ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়

উদাসীন। মাঠ থাকতে হবে, শরীরচর্চার যন্ত্রপাতি থাকতে হবে। কিন্তু এখন এসব কিছুই নেই।

প্রতিবন্ধকতা

আমাদের সমাজে মেয়েদের খেলাধুলার সাথে জড়িত প্রচুর অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার রয়েছে। এগুলো বেশিরভাগ সমাজে মেয়ে ও মা দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। অনেকে বিশ্বাস করেন, মেয়েরা যদি জিমন্যাস্টিক ও অ্যাথলেটিক্স খেলে, তবে তাদের শরীরে এর প্রভাব পড়বে। যা তার মাতৃত্বে, নারীত্বে, এমনকি গর্ভধারণকালে প্রভাব ফেলবে। এটি একপ্রকার মানসিক বাধা। তবে নারী খেলোয়াড়রা কেউই কোনো সামাজিক প্রতিবন্ধকতার শিকার হন নি। এ ব্যাপারে বেনজীর বলেন, 'কে কী বলল, এগুলো আমি কখনো মাথায় নেই না'। তবে মেয়েদের ক্ষেত্রে এই প্রতিবন্ধকতার শিকার হওয়াটা খুব স্বাভাবিক। মেয়েদের সবসময় একটু দমিয়ে রাখার চেষ্টা লক্ষ করা যায় আমাদের সমাজে। ও পারবে না, ওর দ্বারা হবে না, বাইরে যাওয়ার দরকার নেই, মেয়েদের বেলায় এ ধরনের মনোভাব সবসময় দেখা যায়।

সামাজিক প্রতিবন্ধকতা অবশ্যই নেতিবাচক। খেলার ফলে বন্ধুরা আড়চোখে তাকায়। এটি বুঝতে পারে তারা। কিন্তু কেউ সরাসরি কিছু বলে না। এড়িয়ে যায়। মানুষ খারাপ বলবে। সমাজব্যবস্থা এরকমই। সামাজিক প্রতিবন্ধকতাটা ভীতিকর। নারী খেলোয়াড়রা প্রতিবন্ধকতাকে গুরুত্ব দিতে নারাজ। সেতু বলেন, 'যখন আমি মন থেকে চাইব যে আমি খেলব তখন যেকোনোভাবে আমি এটা ম্যানেজ করতে পারব। এটা প্রায়োরিটির ব্যাপার'।

সময় একটি ব্যাপার হতে পারে। তবে খেলোয়াড় যারা খেলছে, তারা পড়াশোনাকে প্রাধান্য দিয়ে তারপরই খেলায় অংশ নিচ্ছে। সমাজ অনেক বড়ো ফ্যাক্টর। অনেকসময় দেখা যায়, চাচা কিংবা কাজিনরা নিষেধ করে। ছোটদের বেলায় গ্রামের অনেকে নিষেধ করে।

সচেতনতা

মেয়েদের খেলাধুলা বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগসুবিধা বাড়ানো যেতে পারে এবং এজন্য কর্তৃপক্ষ উৎসাহমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নিতে পারে। লিলি বলেন, খেলার বিষয়টা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুরোটাই ব্যক্তিগত পর্যায়ে রয়েছে। এজন্য প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আলাদা কোনো প্রায়োরিটি দেওয়া হয় না। অন্য একজন যে আমাকে দেখে খেলার আগ্রহ পাবে, তেমন কোনো উৎসাহমূলক কার্যক্রমও নেই। মেয়েরা অনেক সাহসী কাজ করছে। যদি আমরা খেলাধুলার বিষয়েও তাদের সচেতন করতে পারি, তাহলে সুফল ফলতে পারে। সেটা নিজ উদ্যোগে, হল বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হতে পারে। যারা খেলোয়াড় নন তারা শরীরের ফিটনেস বজায় রাখার জন্য চিন্তিত না। তারা খাওয়াদাওয়ায় সংযমী হয়ে শরীর ঠিক রাখে। তাদের আসলে খেলা করা উচিত। এটা তাদের সাহসী করে তুলবে। আগে থেকে যা শেখানো হয় তারই প্রভাব থাকে। নতুন করে কিছু করা হয়ে ওঠে না। সাধারণ শিক্ষার্থীরা এমন করে ভাবে। আমরা বিষয়টাকে কীভাবে দেখছি সেটিও একটি ব্যাপার।

ব্যক্তিগত আগ্রহের ওপরে অনেক কিছু নির্ভর করে। এদিকে খেলোয়াড় হিসেবে বিভাগে কিছু সুযোগ দেওয়া উচিত বলে মনে করেন খেলোয়াড় শাম্মী।

ধর্ম

মেয়েদের খেলাধুলা প্রসঙ্গে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দশজনের সাতজনই কথা বলতে চান নি। শাম্মী বলেন, 'ধর্ম তো মেয়েদের খেলাধুলা করার ব্যাপারে সরাসরি নিষেধ করেছে'। স্মৃতি বলেন, 'একসময় খেলার প্রতি আগ্রহ ছিল। সেটা কন্টিনিউ করেছে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত। পরে ধর্মীয় কারণে নিজ থেকেই বাদ দিয়েছি। ইসলামে তো মেয়েদের খেলা নিষিদ্ধ'। শাম্মী বলেন, 'ছোটবেলায় মাদ্রাসায় ছিলাম। তখন সুযোগ হয় নি। এখন সুযোগ পেয়েছি তাই খেলছি। তবে ধর্মকে কেন্দ্র করে বলব না যে এতে বাধা আছে। অনেক মুসলিম দেশেই তো মেয়েরা হিজাব পরে খেলছে'। সাধারণ শিক্ষার্থীদের কেউ কেউ মনে করেন, ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞার কারণেই তারা খেলতে আসেন নি।

পোশাক

মেয়েদের খেলার পোশাকটা অনেককে বিব্রত করে। তারা বলেন, আমাদের সমাজের মানুষ মেয়েদের ওই ধরনের পোশাকে দেখে অভ্যস্ত নয়। এজন্য অনেকে খেলায় অংশ নিতে চায় না। আবার অনেকের কাছে পোশাক খারাপ মনে হয় না। এক্ষেত্রে পরিবেশ নয়, প্রধান ফ্যাক্টর হলো মানসিকতা। তবে সাধারণ শিক্ষার্থীদের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী খেলোয়াড়দের দেখতে খুবই ভালো লাগে।

সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির কারণে প্রথম দিকে পোশাক নিয়ে বিব্রত হতে হতো। তখন খেলার পোশাক পরলে লজ্জা করত। এখন আর কিছুই মনে হয় না। লিলি বলেন, 'বান্ধবীদের অনেকে বলে, যখন খেলার পোশাকে দৌড়াদৌড়ি করি, তখন আমাকে দেখতে অনেক খারাপ দেখায়। আমি অবশ্য এসব মন্তব্যকে মোটেই কেয়ার করি না'।

শারীরিক ফিটনেস

সাধারণ মেয়েরা খেলাধুলাকে কম প্রায়োরিটি দেয়। শরীরের ফিটনেস নিয়েও তারা চিন্তিত নয়। বরং খেলার ফলে মেয়েদের যে শারীরিক পরিবর্তন আসে সেটা নিয়েই তারা ভীত ও চিন্তিত। অনেকে মনে করেন, খেলাধুলা করলে মেয়েদের মধ্যে মেয়েলি ভাবটা থাকে না। এটা না থাকা নিয়ে অনেকে উৎকণ্ঠিত থাকে। এ কারণেও অনেকে খেলায় অংশ নিতে চায় না।

অনেকের ক্ষেত্রে পরিবার থেকে বাধাও দেওয়া হয় নি, আবার অনুপ্রেরণাও দেওয়া হয় নি। কেউবা বলেন, দুর্বলতার কারণে খেলা হয় নি, এ বয়সে দৌড়াদৌড়ি করলে সমস্যা মনে হয়। স্মৃতি বলেন, 'স্কুলে প্রতিযোগিতায় দুইবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছি। দীর্ঘ ও উচ্চ লাফে। এখন আর আগ্রহ নেই'।

খেলাধুলা শরীর ঠিক রাখে। এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। সুখী বলেন, 'আমার কিছু বন্ধু মনে করে আমি তো ঠিকমতো হাঁটতেই পারি না, দৌড়াব কী করে? ফুটবল খেলব কী

করে?'। অথচ সুখী ২০১৬ সালের আন্তঃহল ফুটবল টুর্নামেন্টের রানার্সআপ দলের অধিনায়ক।

সার্বিক মূল্যায়ন

বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ও খেলোয়াড় শিক্ষার্থীদের মধ্যে খেলাধুলা বিষয়ে দুই ধরনের মনোভাব লক্ষ করা গেছে। সাধারণ শিক্ষার্থীরা মূলত পরিবারের বাধা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। তা ছাড়া, বিশ্ববিদ্যালয় বা হলের পক্ষে খেলাধুলার উপকারিতা বিষয়ে কোনো সচেতনতামূলক কার্যক্রমও নেই। নেই মেয়েদের খেলার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভালো পরিবেশ নিশ্চিত করার কোনো ব্যবস্থাও। এর ফলে যারা খেলায় আগ্রহী থাকে তারাও পিছিয়ে যায়। সেজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেও যারা খেলাধুলায় অংশ নেন, তারা সেটা করেন তাদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েরা মোটের ওপর এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাকটিভিটিজে আগ্রহী না। শিক্ষার্থীর মেধা মনন ও সৃজনশীলতা বিকাশে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ক্রীড়া ও শারীরিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ব্যাপক। এদেশের নারীরা এখন আর কোনো ক্ষেত্রেই পিছিয়ে নেই। ফলে খেলাধুলায় অংশগ্রহণেও তাদের সমান অংশগ্রহণ কাম্য। কিন্তু কিছু বাধা তাদের সেখান থেকে পিছিয়ে রাখছে। ইচ্ছাশক্তি অনেক বড়ো ব্যাপার। নিজস্ব ইচ্ছায় ও উদ্যোগে এসব বাধা কাটিয়ে যারা অংশ নিচ্ছে, তারা সাফল্যও অর্জন করছে। তবে এই সংখ্যাটা খুবই অপ্রতুল। সেজন্য খেলাধুলায় তাদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার। আর সেটা যদি নাও হয়, প্রতিবন্ধকতাকে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে না দেখে শক্তির উৎস হিসেবে কল্পনা করে নারীদের সামনে এগিয়ে যাওয়া উচিত।

তানজীনা তানীন স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থী, এমসিজে বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। tanjinaru11@gmail.com